আনন্দবাজার পত্রিকা

স্টেশনে গিয়ে দেখুন, প্রতি দিন কত মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়ছেন

# গ্রামে থাকলে খাব কী

কুমার রাণা

১৮ জুলাই, ২০১৯,

মন চায়নি, তবু পালিয়ে এলাম। গ্রামে বড় অশান্তি।” দলে-দলে মারামারি, আশমানে যখন-তখন ধোঁয়া, বাতাসে মুহুর্মুহু আর্তনাদ। নির্দলীয়, অ-হিংস হয়ে থাকতে চাইলেও উপায় নেই— দল ও হিংসা সর্বগ্রাসী। “আপনি দলাদলিতে থাকতে চান না, শান্তিতে ঘর-সংসার করতে চান, কিন্তু করতে দিলে তো? এই বোমা পড়ল, কারও ঘরে আগুন লাগল, কেউ খুন হল। পারবেন শান্তিতে থাকতে?”

এ তো গেল এক রকম অশান্তি। যদি-বা কেউ এড়াতে পারল, জীবনের অন্য অশান্তিগুলো থেকে লোকে কী ভাবে বাঁচবে? “সামান্য জমি, বছরে দু’মাসের ভাতও আসে না। আগে মজুরি করে চলত। এখন জোটে কালেভদ্রে। আগে নদী-নালায় মাছ ধরতাম, ঘাস কেটে বেচতাম, সে সবও গিয়েছে।”

ভারত সরকারের তথ্য বলছে, প্রথাগত জীবিকার সুযোগ সঙ্কুচিত, অথচ নতুন ধরনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা নেই। তদুপরি, “গ্রামের যা অবস্থা, সংসার ফেলে রেখে বাইরে কাজ খুঁজতে যাব, তারও চারা নেই”— জগদীশ তাই সপরিবার কোচবিহার শহরে, পলিথিন টাঙিয়ে বাসা বাঁধেন। ঘর গড়া তো দূর, ভাড়া নেওয়ারও সামর্থ্য নেই। জগদীশ সারা বছর নানা জিনিস বিক্রি করেন। যেমন, এখন কাঁচা আম-মাখা। আবার ক’দিন পর আচার। কখনও ফল, কখনও ফুচকা। যখন যেটা চলে। তাঁর স্ত্রী বাড়ি বাড়ি বাসন মাজেন। দুই কন্যার বড়টি কখনও মায়ের খাটনি

হালকা করে, কখনও বাবার জন্য মশলা তৈরি করে। সে ইস্কুল ছেড়েছে। ছোটটা এখন ক্লাস থ্রি, শহরের এক প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ছে। “বড়টাকে তো পড়াতে পারলাম না, ছোটটা যত দূর পারে পড়ুক।”

কী করেই বা পারবেন? “সারা দিনে সত্তর-আশি টাকা রোজগার হল তো ঢের। এই তো বেলা ডুবতে চলল, তিনশো টাকারও বিক্রি নেই। সব টাকা খেয়ে ফেললে তো চলবে না। কালকের জন্য জিনিস কিনতে হবে। আজ বৃষ্টি হয়ে গেল, বিক্রিও কমে গেল। কাল হয়তো একটু বেশি হবে”, জগদীশের মুখে হার-না-মানা হাসি। “বৌ মাসে হাজারখানেক টাকা পায়, চলে যায়, ভাতটা জুটে যায় দাদা।’’

গ্রামের কথা ভুলতে পারেন না। মন কেমন করলে মাঝে মাঝে যানও সেখানে। ভেঙে পড়া ঘরে দু’দণ্ড থেকে চলে আসেন। ঘর সারাই করার সঙ্গতি নেই। সারাই করলেও ঘরে থাকার কেউ নেই, সে আবার ভাঙবে। “মায়া বাড়িয়ে কী লাভ? এক দিন না এক দিন তো সবই ভুলতে হবে দাদা।” কত কত লোক ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। “স্টেশনে গিয়ে দেখুন না, কত লোক ট্রেন ধরার জন্য বসে আছে, কোথায় মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর, কোন কোন মুলুকে। কী করবে? খাবে কী?” বাস্তবিক, রাত্রি দশটার স্টেশন লোকে পরিপূর্ণ, ওয়েটিং রুমে, প্ল্যাটফর্মে, বাইরের চত্বরে শুয়ে থাকা, বসে থাকা, অপেক্ষায় থাকা— কখন ট্রেন আসবে, যে ট্রেন তাদের নিয়ে যাবে দূর দেশে। কেননা, গ্রামে কাজ নেই। “ছেলে-ছোকরারা তো যাচ্ছেই, এখন অনেকেই ঘর-বংশসুদ্ধ চলে যাচ্ছে। বৌ-বাচ্চাকে কার ভরসায় রেখে যাবে? তাদের নিয়েই চলল। সাত-মাস আট-মাসে এক বার ফিরবে, দু’তিন মাস থাকবে, আবার চলে যাবে। তার পর আস্তে আস্তে ফেরা বন্ধ হয়ে যাবে। আমিই এখন কত কম যাই গ্রামে, আগে মাসে এক বার চলে যেতাম, এখন কমতে কমতে ছ’মাসে ন’মাসে এক বার।”

তা বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে এমন নয়। “যারা পারছে তারা থাকছে। যাদের খানিক জোর আছে। আবার অনেকের কোথাও যাওয়ার নেই বলে গ্রামে পড়ে আছে, বুড়োবুড়িরা।” গ্রামে থাকতে গেলে জোর লাগে। জমি-জায়গা, ব্যবসাপাতি, আর সে সব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পার্টির খুঁটি। পার্টি একটা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। তাতে যারা যোগ দিতে পারল তারা টিকে গেল, বাড়তে লাগল। শহরের সঙ্গেও তাদের আসা-যাওয়া লেগে রইল, আবার গ্রামের ওপরও অধিকার কায়েম থাকল। জগদীশ ও তাঁর মতো হাজার হাজার লোক যখন শহরে নিরুপায় আশ্রিতের জীবন কাটান, তখন গ্রামের ক্ষমতাবানরা শহরে আসে নিজের জোরে, সসম্মানে। ছেলে-মেয়েরা শহরে পড়তে আসতে লাগল, তাদের জ্বর-অসুখে শহরের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসতে লাগল। আর জগদীশদের সন্তান শহরে এসেও স্কুলশিক্ষার নিশ্চয়তা পেল না। ঘরের পাশে মস্ত হাসপাতাল, কিন্তু তাতে চিকিৎসা দূর, জগদীশদের প্রবেশাধিকারও নেই।

উত্তরের কোচবিহার থেকে নেমে আসি কলকাতার উপকণ্ঠে সদ্য গজিয়ে ওঠা বস্তিতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী থেকে উজাড় হয়ে আসা পরিবারগুলোরও অনেকেরই একই কাহিনি। জাতীয় নমুনা

সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ ক্ষেত্রে মাসিক পারিবারিক আয়ের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, মধ্যপ্রদেশের ঠিক ওপরে। এ রাজ্যের ৭৩ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় সাড়ে সাত হাজার টাকার নীচে। এর মধ্যে আবার ৪২ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকার নীচে। এই আয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা যদি হয়ও, নৈমিত্তিক সংঘাতের মুখে পড়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচায় কে? “আমাদের বলল, তোরা বিরোধী, আর আমাদের ঘর ভেঙে দিয়ে গেল, কচি ছেলেটাকেও ছাড়েনি, লাথি মেরে কোমর ভেঙে দিল”, কুলতলি থেকে উৎখাত হয়ে আসা মলিনা কান্না চাপতে পারেন না। “রোজ রোজ মিছিলে ধরে নিয়ে যাবে, অত মিছিল করলে রোজগার করব কখন, খাব কী”— গোসাবা থেকে আসা মনোরঞ্জনের প্রশ্ন। “না-হয় নুন-ভাত খেয়ে থাকব, তবু শান্তিতে থাকতে চাই”, জগদীশ যেন এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

গত শতাব্দীতে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচিগুলো গ্রাম-জীবনে খানিকটা সুস্থিতি এনেছিল। “অনেক আশা ছিল, আমার তখন ছেলেবেলা। গরিবরা দু’কাঠা চার কাঠা জমি পেল, সেই সাঁঝে খেলে সকালে না-খাওয়ার সমস্যা খানিক মিটল। ভাবলাম আরও উন্নতি হবে।” হয়েছিল বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাঙ্কের এক প্রতিবেদন বলছে, গত শতাব্দীতে এ রাজ্যে গ্রামীণ দারিদ্র দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু, জগদীশরা বড় হয়ে উঠতে “আবার যে কে সেই। কেউ কেউ খুব বড়লোক হয়ে গেল। তাদের হাতে সব, পুলিশ তাদের, পঞ্চায়েত তাদের, বিডিও তাদের। আমাদের দেখার কেউ রইল না।” সে অরাজকতার পরিণামে পরিবর্তন হল। “ভাবলাম সত্যিই আমাদের দিন ফিরবে। কিন্তু, কোথায় কী? লাঠিগুলো এক রইল, লাঠিগুলো তেল খেয়ে আরও চকচকে হয়ে উঠল। আগে আমরা জানতাম কার ঘাড়ে কখন সে লাঠি পড়বে, কিন্তু এখন তা হওয়ার নয়। যে কেউ যে কোনও সময় লাঠির ঘায়ে শুয়ে যাবে”, বলছেন মনোরঞ্জন। “পালিয়ে না এসে উপায় কী? যাদের ধন আছে তারা আরও ধনী হচ্ছে। গরিবের জন্য অনেক প্রকল্প হল। কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া গেল। কিন্তু বেশির ভাগটা খেয়ে গেল বুলবুলি। এক বুলবুলি খেল তো আর এক জন ছাড়বে কেন, সেও খেতে চাইল। চলল খাওয়ার লড়াই। বাঁচতে হলে পালাতেই হবে ভাই।”

সবার পক্ষে কেরল, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানায় পালিয়ে কাজ খোঁজা সম্ভব নয়। সবার পক্ষে রাজনীতির ব্যবসা-ব্যাপারে অংশীদারির সুযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গের সেই জনগোষ্ঠী, যারা দিনে একশো-দেড়শো টাকায় সংসার প্রতিপালন করে, তাদের কী হবে? এই মানুষ এতই অসহায় যে, নিজে কী চায় সেটুকু বুঝতেও চোখে অন্ধকার দেখে, যদিও বা বোঝে, সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। কখন যেন তার মন, তার বুদ্ধি, তার যাবতীয় অনুভূতি রাজনীতির পান্ডা-পুরুতের গলায় উন্নয়ন, রাম-ভগবান, দেশমাতা, ইত্যাদি স্বরে ধ্বনিত হয়। লাঠিগুলো লকলকিয়ে ওঠে, এক অসহায় মানুষ অবশিষ্ট দেহশক্তি একত্র করে প্রবল বিক্রমে লাঠি চালিয়ে দেয় অন্য এক অসহায়ের ওপর। বশ্যতার কারখানা চলে, অসহায় মানুষগুলো পরিণত হয় হিন্দুতে, মুসলমানে, গোষ্ঠীস্বার্থের দাসে, অতঃপর

লাশে। মৃতদেহের ওপর গড়ে ওঠে ক্ষমতার সৌধ, অভ্যন্তরে কাপালিকের শবসাধনা, বহির্ভাগে নরঘাতের চারুশিল্প।

একটাই ভরসা, যুগযুগান্তের লোককথা বলে: সাধনা সাঙ্গ হলে শব জেগে ওঠে, মানুষের সাধনায় পুনর্জাত সে লোকের প্রথম ও অন্তিম উৎসর্গ সেই কাপালিক। লোককথা মিথ্যা হয় না।